بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মোতাবেক ১০ তবলীগ ১৪০২ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় আমি পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি বর্ণনা করছিলাম। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আরো কিছু (উদ্ধৃতি) উপস্থাপন করব।

পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'তোহফায়ে কায়সারিয়া' নামক যে পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, যাতে তিনি রানীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ইসলামের তবলীগ করেছিলেন তাতে লেখেন,

"কুরআন গভীর প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ এবং প্রতিটি শিক্ষার ক্ষেত্রে ইঞ্জিলের তুলনায় প্রকৃত পুণ্য শেখানোর ব্যাপারে অগ্রসর। বিশেষত সত্য ও অপরিবর্তনশীল খোদাকে দর্শনের প্রদীপ কুরআনের হাতেই রয়েছে। এটি যদি পৃথিবীতে না আসতো তবে আল্লাহ্ই জানেন, পৃথিবীতে সৃষ্টিপূজা কোন্ রূপ ধারণ করতো? তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয় হলো, খোদার একত্ববাদ যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"

সে যুগে এমন কে ছিল যে এরূপ নির্বিকচিত্তে ভারত-সম্রাজ্ঞীকে এধরনের বার্তা পাঠিয়েছে বা ইসলামের তবলীগ করেছে? ইসলাম ও কুরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার মতো সাহস যাদের মাঝে ছিল না তারাই আজ আমাদের সম্পর্কে বলে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা আহমদীয়া জামা'ত কুরআন অবমাননা করছে, নাউযুবিল্লাহ্। অপরদিকে যারা অমুসলমান, তারা তাদের কর্মকাণ্ড দেখে ইসলামের বিরোধিতায় এতটা অন্ধ হয়ে গিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্যের খণ্ডন তো করতে পারে না, তাই হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য কুরআন পুড়িয়ে নিজেদের অন্তর্জ্বালা মেটায়। যেভাবে সুইডেনে এমন ঘটনা ঘটছে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোতে (মাঝে মধ্যেই এমনটি) ঘটতে থাকে; সম্প্রতিও ঘটেছে। মুসলমানরা যদি যুগের ইমামকে মেনে নেয় এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করে তা পালন করে তাহলে অমুসলমানদের এভাবে কুরআন অবমাননার দুঃসাহস আদৌ হতো না। আল্লাহ্ তা'লাই এদের সুমতি দিন।

এখন পবিত্র কুরআনই একমাত্র হিদায়াতের মাধ্যম– একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **ইসলাম এরূপ আশিসমণ্ডিত ও খোদাদর্শী এক ধর্ম যে, কেউ যদি প্রকৃত অর্থে এর অনুশীলন শিরোধার্য করে এবং এর শিক্ষামালা, নির্দেশাবলী ও ওসীয়্যতসমূহ বাস্তবায়ন করে যা খোদা তা'লার পবিত্র বাণী পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাহলে এই পৃথিবীতেই সে খোদাকে দেখতে পাবে।** [মানুষ জিজ্ঞেস করে, পরকালে আল্লাহ্কে দেখতে হবে, সেটি কীভাবে দেখব? তিনি (আ.) বলেন, যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পালন করো তাহলে এই জগতেই আল্লাহ্কে দেখতে পাবে।] **সেই খোদা,**

যিনি জগদ্বাসীর দৃষ্টি থেকে সহস্র সহস্র পর্দার অন্তরালে রয়েছেন, তাঁকে চেনার জন্য কুরআনের শিক্ষা ব্যতিরেকে আর কোনোই উপায় নেই! পবিত্র কুরআন যুক্তির নিরিখে ও ঐশী নিদর্শনের আলোকে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ বাৎলে দেয়। (এর শিক্ষা পালন করলে এরূপ নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হবে যে, খোদা তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।)

তিনি (আ.) বলেন, **"অধিকন্তু এতে (অর্থাৎ কুরআনে) এক প্রকার কল্যাণ ও আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা খোদান্বেষীদেরকে সর্বদা খোদার পানে আকৃষ্ট করে এবং জ্যোতি, শান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করে। এছাড়া পবিত্র কুরআনের প্রতি সত্যিকার অর্থে ঈমান আনয়নকারী শুধুমাত্র দার্শনিকদের ন্যায় এই ধারণা পোষণ করে না যে, এই প্রজ্ঞাপূর্ণ জগৎ সৃষ্টিকারী কোনো এক সত্তা থাকা উচিত, বরং সে এক ব্যক্তিগত অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করে এবং এক পবিত্র দর্শন লাভ করে একীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করে যে, সত্যিকার অর্থেই সেই স্রষ্টা আছেন আর এই পবিত্র বাণীর জ্যোতি অর্জনকারী কেবলমাত্র শুষ্ক যুক্তিবিদদের মতো এই ধারণা পোষণ করে না যে, খোদা এক ও অদ্বিতীয়। বরং শত শত উজ্জ্বল নিদর্শনের মাধ্যমে যিনি তার হাত ধরে অমানিশা থেকে উদ্ধার করেন, সে সত্যিকার অর্থেই দেখে নেয় যে; প্রকৃতপক্ষেই (নিজ) সত্তা ও গুণাবলীতে খোদা তা'লার কোনোই অংশীদার নেই। আর কেবল এতটুকুই নয়, বরং সে ব্যবহারিকভাবে বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেয় যে, খোদাকে সে এরূপেই দেখে এবং খোদার তৌহীদের মাহাত্ম্য এমনভাবে তার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায় যে, সে ঐশী অভিপ্রায়ের সামনে গোটা বিশ্বকে এক মৃত কীটের ন্যায়, বরং অকেজো বস্তু এবং একেবারে নিরর্থক জ্ঞান করে।"**

পুনরায় পবিত্র কুরআনের জ্ঞানগত এবং কর্মের পূর্ণতার শিক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও কর্মের পরম উৎকর্ষের শিক্ষা রয়েছে।** (সম্পূর্ণ জ্ঞানে ভূষিত করা হয়েছে এবং ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, **বস্তুত اهْدِنَا الصِّرَاطَ-এ জ্ঞানের উৎকর্ষের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনই সেই পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ যার শিক্ষা সঠিক পথের পানে নির্দেশনা প্রদান করে। আর কর্মগত উৎকর্ষ সম্পর্কে صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-এ বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ (এর মাধ্যমে) পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ ফলাফল যেন অর্জিত হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সেসব মানুষের পথে পরিচালিত হওয়ার দোয়া এতে রয়েছে যারা পুরস্কারপ্রাপ্ত।** যাদের কথা গত জুমুআয় আমি উল্লেখ করেছিলাম, অর্থাৎ কারা পুরস্কারপ্রাপ্ত? (তারা হলেন) নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ্‌গণ এবং তাদের দৃষ্টান্তও বিদ্যমান রয়েছে। আর এ যুগেও এমন মানুষ রয়েছেন যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কারে ভূষিত করেন। তিনি (আ.) বলেন, **যেভাবে একটি রোপিত চারা পরিপুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাতে ফুলফল ধরতে পারে না সেভাবেই কোনো হিদায়াতের উন্নত ও উৎকর্ষপূর্ণ ফলাফল বিদ্যমান না থাকলে সেই হিদায়াত মৃত হিদায়াত, যার মাঝে বিকশিত হওয়ার কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। যেভাবে কেউ বেদের শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করার পর এই আশা করতে না পারে যে, সে চিরস্থায়ী মুক্তি বা নাজাত লাভ করবে এবং কীটপতঙ্গ হওয়ার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করবে, তাহলে এই শিক্ষার লাভ কী? কিন্তু পবিত্র**

কুরআন এমন এক হিদায়াত যে, এর অনুসারী উন্নত মানের উৎকর্ষ লাভ করে এবং খোদা তা'লার সাথে তার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। এমনকি তার পুণ্যকর্ম যা কুরআনের শিক্ষাসম্মত পন্থায় করা হয়ে থাকে তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এক পবিত্র বৃক্ষের উপমার ন্যায় বড় হতে থাকে এবং ফুলফল ধারণ করে আর এক বিশেষ ধরনের মিষ্টতা ও স্বাদ এতে সৃষ্টি হয়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা সেই সময় পৃথিবীতে এসেছিল যখন বড় বড় নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক বিশ্বাসগত ও কর্মসংক্রান্ত ভুলভ্রান্তির প্রচলন হয়ে গিয়েছিল আর প্রায় সকল মানুষ অপকর্ম ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত প্রদান করছেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ সকল মানুষ, আহলে কিতাব হোক কিংবা অন্যরা– সবাই বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমজ্জিত ছিল এবং পৃথিবীতে চরম নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। মোটকথা, এমন যুগে খোদা তা'লা সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডনের জন্য পবিত্র কুরআনের মতো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আমাদের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাতে সকল ভ্রান্ত ধর্মের খণ্ডন বিদ্যমান রয়েছে। আর বিশেষভাবে সূরা ফাতিহা, যা পাঁচবেলার নামাযের প্রতি রাকাতেই পাঠ করা হয়, তাতে ইঙ্গিতস্বরূপ সকল বিশ্বাসের উল্লেখ রয়েছে। যেমনটি বলেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসা সেই খোদার জন্য প্রযোজ্য যিনি সকল জগতের স্রষ্টা। اَلرَّحْمٰنِ তিনি এমন স্রষ্টা যিনি কারো কোনো কর্ম ছাড়াই (তাকে) সৃষ্টি করেন এবং কোনো কর্ম ছাড়াই দান করেন; তাঁর রহমানিয়্যত এভাবেই কাজ করে। اَلرَّحِيْمِ তিনি কর্মের প্রতিফলদাতা। যে কর্ম করবে তার প্রতিদান দেন, দোয়া করলে তা গ্রহণ করেন। তিনি مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ – বিচার দিবসের মালিক, আর তাঁর শাস্তি ও পুরস্কারের (বিধান) এই ইহজগতেও আছে এবং পরকালেও আছে। তিনি (আ.) বলেন, এই চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গোটা বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের বর্ণনা রয়েছে। মানুষ যদি অভিনিবেশের সাথে পাঁচবেলার নামাযে এটি পাঠ করে তাহলে অনেক বড় মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে।

পবিত্র কুরআন একটি মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মু'জিযা'র প্রকৃত মর্ম হলো, মু'জিযা এমন অলৌকিক নিদর্শনকে বলা হয় প্রতিপক্ষ যার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে না। (কোনো দৃষ্টান্ত বা উপমা উপস্থাপন করতে পারে না।) যদিও সে বিষয়টি বাহ্যত মানবীয় সাধ্যের কাজ বলেই মনে হোক না কেন। যেমন পবিত্র কুরআনের মু'জিযা, যা আরবের সকল বাসিন্দার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অতএব সেটি যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের অন্তর্গত বলেই মনে করা হচ্ছিল, কিন্তু এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে আরবের সকল বাসিন্দা ব্যর্থ হয়। কাজেই মু'জিযার তাৎপর্য বোঝার জন্য পবিত্র কুরআনের বাণী অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ বাহ্যত এটিও একটি বাণী যেভাবে মানুষের কথা বা বাণী হয়ে থাকে, কিন্তু এটি স্বীয় বাগ্মিতাপূর্ণ বর্ণনার নিরিখে এবং ভাষার মাধুর্য, সুস্পষ্টতা এবং সুন্দর অর্থবহ বাক্যের দিক দিয়ে যা কিনা সর্বত্র সত্য এবং প্রজ্ঞা বজায় রাখে, এছাড়া অত্যন্ত উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিনা সমগ্র বিশ্বের বৈরী দলীল-প্রমাণের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে, অধিকন্তু বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর নিরিখে এমন এক অতুলনীয় মু'জিযা যার মোকাবিলা তেরোশ' বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো

বিরুদ্ধবাদী করতে পারে নি আর কারো তা করার শক্তিও নেই। পৃথিবীর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে পবিত্র কুরআনের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত যে, এটি অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকেও মু'জিযাপূর্ণ বাক্যাবলীতে বর্ণনা করেছে যা উচ্চমার্গের বাগ্মিতাপূর্ণ এবং সত্য ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। মোটকথা, মু'জিযার প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য হলো, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অথবা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে একটি পার্থক্য প্রদর্শন করা। আর এমন স্বতন্ত্র বা পার্থক্যসূচক বিষয়ের নাম হলো মু'জিযা বা অন্য কথায় নিদর্শন। নিদর্শন এমন এক অপরিহার্য বিষয় যা ব্যতীত খোদা তা'লার অস্তিত্বের ওপরও পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব নয়, আর না সেই ফল লাভ করা সম্ভব যা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের আলোকে লাভ হতে পারে। এটি জানা কথা যে, ধর্মের প্রকৃত সত্যতা খোদা তা'লার অস্তিত্বের পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সত্য ধর্মের অপরহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির মধ্যে এটি আবশ্যক বিষয় যে, তাতে এমন নিদর্শন পাওয়া যাবে যা খোদা তা'লার অস্তিত্বের অকাট্য এবং সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রদান করে। আর সেই ধর্ম নিজের মধ্যে এমন জোরালো শক্তি রাখে যা এর অনুসারীদের হাত খোদা তা'লার হাতের সাথে মিলিয়ে দেয়; [আল্লাহ্‌র সাথে এমন (নিবিড়) সম্পর্ক গড়ে দেয়।] **শুধুমাত্র সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রয়োজন অনুভব করা এবং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জিত না হওয়া– এটি পরিপূর্ণরূপে খোদাকে চেনার জন্য যথেষ্ট নয়।** [কেবল এতটুকু জানা যে, একজন সৃষ্টিকারী আছেন– এতটুকুই যথেষ্ট নয়।] **আর এখানেই যারা আটকে থাকে তারা খোদা তা'লার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না আর স্বীয় আত্মাকে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্রও করতে পারে না।** [শুধু এতটুকু জ্ঞান অর্জন করা যে, কোনো একজন (স্রষ্টা) আছেন– এতে তো আত্মার পরিশুদ্ধি হতে পারে না কিংবা আল্লাহ্ তা'লার সাথেও সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে না।] **এ থেকে যদি কিছু অনুধাবন করা যায় তাহলে তা কেবল এতটুকুই যে, এই সুদৃঢ় এবং পরিপূর্ণ ও নিখুঁত সৃষ্টির একজন স্রষ্টা থাকা উচিত; কিন্তু সেই স্রষ্টা যে প্রকৃতই আছেন– তা নিশ্চিত হওয়া যায় না!** [অর্থাৎ এই বিশ্বজগত এবং পৃথিবীতে যা কিছুই আমরা দেখতে পাই তার কোনো সৃষ্টিকর্তাও আছে– এই প্রকৃত জ্ঞানও থাকা উচিত। আর যখন এই জ্ঞান থাকবে যে, তিনি কে, আর আমরা যে খোদার ইবাদত করি তিনিই সেই খোদা– তখনই প্রকৃত সম্পর্কও সৃষ্টি হয়; তখনই আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ হয় আর মানুষ নিজ আত্মার সংশোধনের প্রতিও দৃষ্টি দেয়।] তিনি (আ.) বলেন,

আর জানা কথা যে, কেবল প্রয়োজনকে অনুভব করা একটি ধারণা মাত্র, যা দর্শনের বিকল্প হতে পারে না, আর দর্শনের পবিত্র ফলাফলও তাতে সৃষ্টি হতে পারে। [কোনো কিছু ধারণা করা আর দেখার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে।] **অতএব যে ধর্ম মানুষের খোদার পরিচয় লাভকে কেবলমাত্র 'থাকা উচিত'-এর অসম্পূর্ণ স্তর পর্যন্তই ছেড়ে দেয় তা তার ব্যবহারিক অবস্থার চিকিৎসক নয়। অতএব বাস্তবিক অর্থে এমন ধর্ম হলো এক মৃত ধর্ম যার কাছে কোনো পবিত্র পরিবর্তনের আশা করা এক দুরাশা মাত্র। জানা কথা যে, কেবল যৌক্তিক প্রমাণাদি ধর্মের সত্যতার জন্য পরিপূর্ণ সাক্ষ্য হতে পারে না আর এটি এমন মোহর নয় যে, কোনো প্রতারক তা বানাতে সমর্থ হবে না, বরং এটি যুক্তির সার্বজনীন প্রস্রবণের এক রিক্ততা বিবেচিত হবে।** [শুধু যৌক্তিক প্রমাণ তো উপস্থাপন করা যেতে পারে

অথবা যুক্তির ভিত্তিতে কেউ অনেক বড় বড় কথাও বলতে পারে; কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীকে মানুষ জানবে এবং সেগুলো দ্বারা উপকৃত হবে।]

তিনি (আ.) বলেন, **এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত কে দেবে যে, যৌক্তিক কথা যা এক গ্রন্থে লেখা হয়েছে সেগুলো আসলে এলহামী নাকি অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে চুরি করে লেখা হয়েছে? যদি ধরেও নেয়া হয় যে, সেগুলো চুরি করা নয়, তবুও আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে সেগুলো কীভাবে অকাট্য দলীল হতে পারে আর কোনো সত্য সন্ধানীর হৃদয় কীভাবে এর মাধ্যমে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে যে, কেবল সেসব যৌক্তিক কথাই নিশ্চিতভাবে খোদা দর্শনের দর্পণ হতে পারে? আর কীভাবে এই স্বস্তিও লাভ হতে পারে যে, সেসব কথা সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত?** [অর্থাৎ সেগুলো এমন নিদর্শন যা আল্লাহ্ তা'লার পানে নিয়ে যায় অথবা সকল প্রকার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত।] **অতএব যদি ধর্ম কেবল কিছু কথাকে যুক্তি বা দর্শনের প্রতি আরোপ করে নিজ সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে আর ঐশী নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদি প্রদর্শনে সমর্থ না হয় তাহলে এমন ধর্মের অনুসারী প্রতারণার শিকার বা প্রতারিত আর সে অন্ধকারেই মৃত্যু বরণ করবে। মোটকথা শুধুমাত্র যৌক্তিক প্রমাণাদি দ্বারা তো খোদা তা'লার অস্তিত্বও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে না, কোনো ধর্মের সত্যতা এর মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়া দূরে থাক! আর যতক্ষণ কোনো ধর্ম এই কথার দায়িত্ব গ্রহণ না করবে যে, তা খোদা তা'লার সত্তাকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে দেখাবে ততক্ষণ সেই ধর্ম কোনো মূল্য রাখে না। আর সেই মানুষ হতভাগা যে এমন ধর্মের প্রেমিক। সেই ধর্ম নিজ ললাটে অভিশাপের কলঙ্ক বয়ে বেড়ায় যা মানুষের প্রজ্ঞাকে সেই স্তরে উপনীত করতে পারে না যার মাধ্যমে সে খোদার দর্শন লাভ করতে পারে।**

অতএব এটি হলো সেই স্তর যা আমাদের অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত। অর্থাৎ খোদা তা'লাকে চেনা এবং নিদর্শনের মাধ্যমে চেনা, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে চেনা, কেবল যৌক্তিক প্রমাণের আলোকে নয়। আর এরপর খোদা তা'লার যে স্বরূপ মানুষের সামনে উন্মোচিত হয় তা হলো বাস্তব (স্বরূপ)। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের মাঝে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, বিধর্মী বরং ধর্মহীন বরং খোদা তা'লাকে যারা মানে না– তাদের মাঝেও খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে; যৌক্তিক প্রমাণ দেয়া হয়েছে আর এরপর যখন নিদর্শন দেখানো হয়েছে এবং (এ সংক্রান্ত) ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তখন তারা ধর্মকেও মেনেছে আর ইসলামকেও মেনে নিয়েছে। এখানে পাশ্চাত্যেও এমন মানুষ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলজিয়ামের এক বন্ধু ছিলেন যিনি নাস্তিক ছিলেন। মূলত তিনি ইন্দোনেশিয়ান, পরবর্তীতে বেলজিয়ামে এসে স্থায়ী হয়েছেন। **তিনি বয়আত করেন এবং তিনি আমাকে স্বয়ং বলেছেন যে, আমি যখন খোদা তা'লার অস্তিত্বকে স্বীকার করি, শুধু যৌক্তিক দিক থেকেই নয়, বরং বাস্তব প্রমাণের ভিত্তিতে আর নিদর্শনের মাধ্যমে, তখন আমার জন্য আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামকে স্বীকার না করার আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি বলেন, আর যেহেতু আহমদীয়াত আমাকে উক্ত পথ দেখিয়েছে তাই আমি আহমদী মুসলমান হয়েছি।**

অতঃপর পবিত্র কুরআন এই দাবি করে যে, এটি মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেন, **এই আয়াতসমূহে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক লুক্কায়িত আছে তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেনঃ**

الٓمٓ . ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ এটি সেই কিতাব যা খোদা তা'লার জ্ঞানসহ প্রকাশিত হয়েছে। আর যেহেতু তাঁর জ্ঞান অজ্ঞতা এবং ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত, [অজ্ঞতা ও ভুলত্রুটিমুক্ত,] **তাই এই কিতাব সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার জ্ঞান মানবের পূর্ণতার জন্য নিজের মাঝে একটি পরিপূর্ণ শক্তি বহন করে, তাই এই কিতাব মুত্তাকীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ পথনির্দেশনা। আর তাদেরকে সেই স্তরে উপনীত করে যা মানুষের স্বভাবজ উন্নতির চূড়ান্ত শিখর।**

অতঃপর মুত্তাকী কারা যারা হিদায়াত লাভ করে– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতসমূহে বলেছেন, মুত্তাকী হলো তারা যারা অদৃশ্য খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং নামায কায়েম করে আর নিজের ধনসম্পদ থেকে কিছুটা খোদার রাস্তায় খরচ করে। অধিকন্তু পবিত্র কুরআন এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনে। তারাই হিদায়াতের শীর্ষে রয়েছে এবং তারাই পরিত্রাণ লাভ করবে।** এটি হলো মুত্তাকীর সংজ্ঞা।

অতঃপর পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ণ এবং উৎকর্ষ ধর্মগ্রন্থ হওয়ার বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, এ বিষয়টি প্রমাণিত যে, পবিত্র কুরআন ধর্মকে পরিপূর্ণ করার সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। যেমনটি তা নিজেই ঘোষণা করে যে, **اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا** অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের ধর্মকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং স্বীয় নিয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব পবিত্র কুরআনের পর আর নতুন কোনো কিতাবের আসার সুযোগ নেই, কেননা মানুষের যা কিছু প্রয়োজন ছিল তার সবই পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে দিয়েছে। এখন কেবল ঐশী বাক্যালাপের দরজা খোলা রয়েছে আর তা-ও স্বাধীনভাবে নয়, বরং সত্য এবং পবিত্র বাক্যালাপ যা স্পষ্ট ও প্রকাশ্যরূপে ঐশী সাহায্যের রং নিজের মাঝে ধারণ করে আর অগণিত অদৃশ্য বিষয় সংবলিত হয়ে থাকে, তা আত্মশুদ্ধির পর কেবল পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

পরিতাপ যে, আমাদের বিরোধীরা এসব প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনতে চায় না এবং আমাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, নাঊযুবিল্লাহ্, আমরা পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করেছি।

পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হওয়ার বিষয়ে তিনি (আ.) তাঁর চশমায়ে মা'রেফাত পুস্তকে বলেন, পবিত্র কুরআন এমন এক প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ যা আধ্যাত্মিক চিকিৎসার সমস্ত নীতিকে অর্থাৎ ধর্মের নিয়মাবলীকে, যা মূলত আধ্যাত্মিক চিকিৎসা, দৈহিক চিকিৎসার সমস্ত নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে। [অর্থাৎ সেটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আখ্যা দিয়েছে।] আর এই সমতা বিধান এতই সূক্ষ্ম যা শত শত সত্য ও তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচনের দ্বার। আর পবিত্র কুরআনের সত্য ও পরিপূর্ণ তফসীর সেই ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি দৈহিক চিকিৎসার সমস্ত নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নিয়মনীতির

প্রতি দৃষ্টি দেয়। তিনি (আ.) বলেন, একবার আমাকে কয়েকজন গবেষক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কিছু বই কাশফে (বা দিব্যদর্শনে) দেখানো হয়। [অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পথনির্দেশনা দান করেন; কতক চিকিৎসকের লেখা বইপত্র কাশফে দেখানো হয়] যেগুলো দৈহিক চিকিৎসার সমস্ত নীতি, জ্ঞান সংক্রান্ত নিয়মনীতি এবং (মানবদেহের) ছয়টি তন্ত্র ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় সমৃদ্ধ ও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। [অর্থাৎ সে সম্পর্কিত ছিল।] এগুলোর মাঝে অভিজ্ঞ ডাক্তার **কারশী**র পুস্তকও ছিল। [অর্থাৎ এগুলোর মাঝে একটি পুস্তক কারশীর ছিল যিনি একজন প্রসিদ্ধ হাকীম ছিলেন।] আর এদিকে ইশারা করা হয় যে, এটিই কুরআনের তফসীর। এ থেকে জানা গেল যে, শরীরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মাঝে অত্যন্ত গভীর ও প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং একটি অপরটির সত্যায়নকারী। দৈহিক চিকিৎসার যেসব পুস্তক ছিল সেগুলো সামনে রেখে আমি যখন পবিত্র কুরআনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীরিক চিকিৎসার সমস্ত নীতির কথা অত্যন্ত প্রাঞ্জলরূপে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান পেয়েছি। [অর্থাৎ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্যও পবিত্র কুরআন থেকে সঠিক সাহায্য পাওয়া যায়। এছাড়া এক্ষেত্রে প্রণিধান করার জন্য, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যুগ-ইমামের কথাগুলো শোনা আবশ্যক, তাঁর রচনাবলী পাঠ করা আবশ্যক।]

পবিত্র কুরআনই তাআল্লুক বিল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ার প্রকৃত মাধ্যম– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখো! পরম মার্গের অদৃশ্য খোদাকে মানুষ কোনোক্রমেই স্বীয় শক্তিবলে শনাক্ত করতে পারে না যতক্ষণ তিনি স্বয়ং নিজ সত্তাকে নিজের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে চিনিয়ে না দেন। আর খোদা তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক আদৌ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেই সম্পর্ক বিশেষভাবে খোদা তা'লার মাধ্যমে সৃষ্টি না হয় এবং প্রবৃত্তিগত অপবিত্রতা ও ময়লা আবর্জনা কোনোক্রমেই প্রবৃত্তি থেকে দূর হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে একটি জ্যোতি হৃদয়ে প্রবেশ না করে। দেখো! আমি এই চাক্ষুস সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি যে, পবিত্র কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল সেই সম্পর্ক লাভ হয়ে থাকে। অন্য কোনো কিতাবেই এখন আর প্রাণের স্পন্দন নেই এবং আকাশের নীচে কেবল একটিমাত্র কিতাবই অবশিষ্ট রয়েছে যা সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের চেহারা প্রদর্শন করে, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন।

অতএব পবিত্র কুরআনের নির্দেশ মেনে কাজ করলে খোদা তা'লার চেহারা দেখা সম্ভব। আমাদের আহমদীদের জন্যও এটি চিন্তার বিষয়। আমরা কতজন আছি যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করি, গভীর মনোযোগের সাথে পড়ি ও অভিনিবেশ করি? এজন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী পুণ্যবান লোকদের স্বচক্ষে দেখা ঘটনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণ যা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ পদক্ষেপে সম্পন্ন হয় তাতে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, ধীরে ধীরে এক-অদ্বিতীয় খোদার ভালোবাসা হৃদয়ে গ্রথিত হয়ে যায়। এছাড়া ঐশী কালামের আধ্যাত্মিক শক্তি মানবাত্মাকে এক নূর বা জ্যোতি দান করে যার মাধ্যমে তার দৃষ্টি উন্মুক্ত হয় আর

অবশেষে সে পরজগতের অলৌকিক নির্দশনসমূহ দেখতে পায়। অতএব সেদিন থেকে সে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাসের আলোকে বুঝতে পারে, খোদা আছেন। আর এরপর এ বিশ্বাস উন্নতি করতে থাকে ও এভাবে জ্ঞানভিত্তিক বিশ্বাস থেকে চাক্ষুস বিশ্বাসের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর এরপর চোখে দেখা বিশ্বাস অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনে সে প্রথমে কোনো আত্মিক পবিত্রতা লাভ করে না আর সে অনেক ধরনের পাপে লিপ্ত থাকে। এরপর খোদা তাঁর অনুগ্রহের হাত তার দিকে প্রসারিত করেন এবং বিভিন্ন অলৌকিক পন্থায় তার ঈমানকে শক্তিশালী করা হয় আর যেভাবে পবিত্র কুরআনে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ ঈমানদার লোকেরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়– অনুরূপভাবে সে-ও নিজের সত্তা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সুসংবাদ পেতে থাকে, এবং এসব সুসংবাদের ফলে যেমন একদিকে তার ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে তেমনিভাবে সে পাপ এড়িয়ে চলে এবং পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ যা আর্যদের এক সভায় পাঠ করা হয়েছিল তাতে পবিত্র কুরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, সুস্থ বিবেক যেটিকে এলহামী কিতাব চেনার জন্য স্বতন্ত্র নিদর্শন আখ্যা দিয়েছে তা কেবল খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে বিদ্যমান। আর এ যুগে সেই সব বৈশিষ্ট্য যা খোদার কিতাবের অনন্য নিদর্শনরূপে থাকা উচিত তা অন্যান্য কিতাবে নিশ্চিতভাবে নেই। হতে পারে কোনো এক কালে এগুলোতে সেসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। আর যদিও আমরা একটি দলিলের ভিত্তিতে সেগুলোকে এলহামী কিতাব মনে করি যা আমরা ইতঃপূর্বে লিখেছি, কিন্তু সেগুলো এলহামী হলেও বর্তমান অবস্থার নিরিখে পুরোপুরি অকেজো এবং সেই রাজকীয় দুর্গের ন্যায় যা পরিত্যাক্ত ও জনমানবহীন হয়ে পড়ে আছে আর সকল ধনসম্পদ এবং সেনাশক্তি তা থেকে হারিয়ে গেছে।

এছাড়া আরো অনন্য বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, এখন আমি পবিত্র কুরআনের এমন সব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা নিম্নে বর্ণনা করব যা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। এক নম্বর হলো এতে এক অসাধারণ শক্তি রয়েছে যা এর অনুসারীদের অনুমাননির্ভর তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায় থেকে নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। [কেবল অনুমান নয় বরং নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়।] আর সেটি হলো, একজন মানুষ যখন পূর্ণরূপে এর অনুসরণ করে তখন ঐশী শক্তির দৃষ্টান্ত নিদর্শনরূপে তাকে দেখানো হয় এবং খোদা তার সাথে কথোপকথন করেন আর নিজ বাণীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়ে তাকে অবগত করেন। পবিত্র কুরআনের এসব কল্যাণকে আমি কল্পকাহিনী হিসেবে বর্ণনা করি না, বরং আমি সেসব অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে থাকি যা স্বয়ং আমাকে দেখানো হয়েছে। সেসব নির্দশনের সংখ্যা প্রায় এক লাখ বরং সেগুলো সম্ভবত এক লাখেরও অধিক হবে। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমার এই বাণীর অনুসরণ করবে সে কেবল এই কিতাবের বিভিন্ন নিদর্শনের প্রতিই ঈমান আনবে না বরং তাকেও নিদর্শনাবলী দেয়া হবে। অতএব আমি নিজে খোদার বাণীর প্রভাবে সেসব নিদর্শন পেয়েছি যা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধ্বে আর

কেবলই আল্লাহ্ তা'লার কাজ। সেই ভূমিকম্প যা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে, সেই প্লেগ যা পৃথিবীকে গ্রাস করছে– সেগুলো এসব নিদর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, এসব নির্দশন আমার নয় বরং পবিত্র কুরআনের, কেননা আমি এ কাজ এরই শক্তি এবং এরই দেয়া প্রেরণায় করছি। বস্তুত পবিত্র কুরআনের বলিষ্ঠ শক্তিগুলোর একটি শক্তি হলো, এর অনুসারীকে বিভিন্ন নিদর্শন ও অলৌকিকতা দান করা হয় আর সেগুলো এত বেশি হয় যে, পৃথিবী এর মোকাবিলা করতে পারে না। অতএব আমি এ দাবিই করছি এবং বজ্রকণ্ঠে বলছি যে, পৃথিবীর সকল বিরোধী, তারা প্রাচ্যেরই হোক বা পাশ্চাত্যেরই হোক, সবাই যদি একটি মাঠে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন ও মু'জিযা (প্রদর্শনের) ক্ষেত্রে আমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায় তাহলে আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁর প্রদত্ত সামর্থ্য দিয়ে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী হব। আর এই বিজয় এজন্য অর্জিত হবে না যে, আমার আত্মায় শক্তির পরিমাণ কিছুটা বেশি রয়েছে; বরং এ কারণে হবে যে, খোদা তা'লা চেয়েছেন আমি যেন তাঁর বাণী পবিত্র কুরআনের বলিষ্ঠ শক্তি এবং তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক শক্তি ও সুউচ্চ পদমর্যাদার প্রমাণ উপস্থাপন করি, আর তিনি আমার কোনো যোগ্যতাবলে নয় বরং শুধুমাত্র নিজ কৃপাগুণে আমাকে এই সৌভাগ্য দিয়েছেন যে, আমি তাঁর সুমহান নবী ও তাঁর অত্যন্ত শক্তিশালী বাণীর অনুসরণ করি এবং তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করি, আর আমি খোদার সেই বাণীর প্রতি ঈমান রাখি যার নাম পবিত্র কুরআন আর যা ঐশী শক্তিমত্তার বিকাশস্থল। এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (সূরা ইউনুস: ৬৫) এবং এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, وَاَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (সুরা মুজাদেলা: ২৩) আর এ প্রতিশ্রুতিও রয়েছে যে, يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا (সূরা আল্ আনফাল: ৩০)— এসব প্রতিশ্রুতি অনুসারেই খোদা আমাকে এসব দান করেছেন। এসব আয়াতের অনুবাদ হলো, যারা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে তাদেরকে সত্যস্বপ্ন ও এলহাম দেয়া হবে; অর্থাৎ অনেক বেশি দেয়া হবে, অন্যথায় ব্যতিক্রম হিসেবে তো অন্যরাও সত্যস্বপ্ন দেখতে পারে। কিন্তু এক সমুদ্রের সাথে একটি বিন্দুর কোনো তুলনা হয় না এবং এক ধনভাণ্ডারের সাথে একটি পয়সার কোনো সাদৃশ্য চলে না। এরপর তিনি (আ.) বলেন, পূর্ণ অনুসারীকে রূহুল কুদুস (ফিরিশ্‌তা) দ্বারা সাহায্য করা হবে, অর্থাৎ তার জ্ঞানবুদ্ধি অদৃশ্য থেকে একপ্রকার জ্যোতি লাভ করবে আর তাদের কাশফী অবস্থা একান্ত স্বচ্ছ করা হবে আর তাদের কথা ও কাজে প্রভাব সৃষ্টি করা হবে এবং তাদের ঈমান অত্যন্ত সুদৃঢ় করা হবে। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে আর অন্যদের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে দিবেন, অর্থাৎ সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান যা তাদেরকে দেয়া হবে আর যে অলৌকিক নিদর্শন তারা লাভ করবে এর বিপরীতে অন্য সকল জাতি ব্যর্থ হবে। তিনি (আ.) বলেন, অতএব আমরা দেখেছি যে, আদিকাল থেকে খোদা তা'লার এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে এসেছে আর এ যুগে আমরা নিজেরাও এর চাক্ষুস সাক্ষী।

অতএব মুসলমানরাও এটি বুঝতে সমর্থ হোক আর আমরাও যেন এর সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি যে, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছেন আর

সেই নিদর্শনের ধারা আজও অব্যাহত আছে। আর যে-ই সঠিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার বাণী (কুরআন)-এর অনুসরণ করে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর কিছু না কিছু স্বাদ আস্বাদন করাতে থাকেন।

তিনি (আ.) আরো বলেন, আমি তো পবিত্র কুরআনের মহান শক্তির উল্লেখ করলাম যা নিজ অনুসারীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু এটি (তথা কুরআন) অন্যান্য অলৌকিক নিদর্শন দ্বারাও পরিপূর্ণ। কুরআন ইসলামের উন্নতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং বিজয়ের সংবাদ সেই সময় দিয়েছে যখন মহানবী (সা.) মক্কার মরু অঞ্চলে একাকী ঘুরে বেড়াতেন আর তাঁর সাথে কতিপয় দরিদ্র এবং দুর্বল মুসলমান ছাড়া আর কেউ ছিল না। আর রোমান-সম্রাট যখন ইরানীদের সাথে যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং পারস্য-সম্রাট তার সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ দখল করে নেয় তখনও কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, নয় বছরের মধ্যে পুনরায় রোমান-সম্রাট বিজয়ী হবে আর ইরানকে পরাস্ত করবে। বস্তুত এমনটিই ঘটেছিল। তেমনিভাবেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের মহান নিদর্শন যা কিনা ঐশী শক্তির পরিচায়ক– এর কথাও পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, মহানবী (সা.)-এর আঙুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় এবং কাফিররাও এই অলৌকিক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে।

এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে তাঁর (আ.) পুস্তক 'চশমায়ে মা'রেফাত'-এ উল্লিখিত আছে। আমি যৎসামান্য উল্লেখ করছি। পবিত্র কুরআনের কাহিনীগুলো মূলত ভবিষ্যদ্বাণী– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় 'চশমায়ে মা'রেফাত' পুস্তকে তিনি (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআনে যতটা কাহিনী আছে, সেগুলো মূলত কাহিনী নয় বরং তা হলো ভবিষ্যদ্বাণী যা গল্প আকারে বর্ণিত হয়েছে। তবে হ্যাঁ, তওরাতে এগুলো শুধুই গল্পকাহিনী হিসেবে পাওয়া যায়, কিন্তু পবিত্র কুরআন প্রত্যেক ঘটনাকে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের জন্য এক ভবিষ্যদ্বাণী আখ্যা দিয়েছে আর এই কাহিনীসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও পরম স্বচ্ছতার সাথে পূর্ণ হয়েছে। মোটকথা পবিত্র কুরআন তত্ত্বজ্ঞানের এক সমুদ্র আর ভবিষ্যদ্বাণীর এক মহাসাগর এবং এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে, কোনো মানুষ পবিত্র কুরআন ব্যতিরেকে পূর্ণরূপে খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনতে পারে। কেননা এই বিশেষত্ব বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনেরই রয়েছে, অর্থাৎ এর পূর্ণ অনুসরণে খোদা আর বান্দার মাঝে যে আচ্ছাদন অন্তরায় হিসেবে রয়েছে তা পরিপূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে যায়। অন্য ধর্মের অনুসারীরা কেবল গল্প আকারে খোদা তা'লার নাম স্মরণ করে, কিন্তু পবিত্র কুরআন সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের চেহারা দেখিয়ে দেয় আর বিশ্বাসের জ্যোতি মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দেয়, আর সেই খোদা! যিনি সমগ্র বিশ্ব থেকে গুপ্ত ছিলেন তিনি শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই প্রকাশিত হন। শর্ত হলো, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রকৃত অর্থেই পালন করতে হবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনের দু'টি অংশ বিদ্যমান, একটি হলো ঘটনাবলী আর অপর অংশ বিধি-বিধান। কোনো বিষয় গল্পের আকারে হয়ে থাকে আর কিছু অংশ শরীয়তের বিধানরূপে হয়ে থাকে। যারা ঘটনাবলী এবং শরীয়তের বিধানের মাঝে পার্থক্য করে না তাদেরকে অনেক কঠিন সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। আর তারা পবিত্র কুরআনে স্ববিরোধ সাব্যস্ত করার কারণ হয়ে থাকে, যেন নিজের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনকে হাতছাড়া করে ফেলে। কেননা পবিত্র

কুরআন সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (সূরা আন্ নিসা: ৮৩) অর্থাৎ এটি যদি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে অবশ্যই এতে অনেক স্ববিরোধ পাওয়া যেতো। স্ববিরোধ না থাকাই এর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেহেতু কুরআনে কোনো স্ববিরোধ নেই তাই এটি (সুনিশ্চিত) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু এই অপরিণামদর্শীরা ঘটনাবলী এবং শরীয়তের মাঝে পার্থক্য না করার কারণে এতে স্ববিরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে (প্রকারান্তরে) সাব্যস্ত করে– এটি আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো রচনা। পরিতাপ– কী বুদ্ধি এদের! [যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী আর অন্যগুলো বিধি-বিধান। এগুলো যদি কেউ গুলিয়ে ফেলে তাহলে তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। তাদের নিজেদের এসব বুঝার মতো তত্ত্বজ্ঞান নেই, আর যে তফসীর করা হয় তখন এর প্রতি বিকৃতির অপবাদ আরোপ করে।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সুমহান সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনের অসাধারণ গুণাবলীর মাঝে এর শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা সেটি মানব প্রকৃতি এবং মানবীয় প্রয়োজনের একেবারে উপযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, তওরাতের শিক্ষা হলো দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ। আর ইঞ্জিল বলে, কখনোই অন্যায়ের মোকাবিলা করো না, বরং যদি কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে তাহলে অপর গালও পেতে দাও। কিন্তু কুরআন বলে وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ (সূরা আশ্ শূরা-৪১) অর্থাৎ, অন্যায়ের শাস্তি ততটুকুই যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজ অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করে এবং এই অপরাধ ক্ষমা করার ফলে অপরাধীর সংশোধন হয় এবং ভবিষ্যতে পাপ থেকে বিরত হয় তাহলে ক্ষমা করা প্রতিশোধ গ্রহণের চেয়ে উত্তম, নতুবা শাস্তি দেয়া উত্তম। মানব প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে; কেউ কেউ এমন রয়েছে যাদেরকে ক্ষমা করলে সেই পাপের নামও আর নেয় না এবং বিরত হয়। তবে এমনও কিছু রয়েছে যারা কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েও পুনরায় সেই একই অপকর্ম করে। মানব প্রকৃতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে এজন্য এই শিক্ষাই যথোপযুক্ত যা পবিত্র কুরআন উপস্থাপন করেছে। তওরাত এবং ইঞ্জিলের শিক্ষা কখনোই পরিপূর্ণ নয়। বরং সেসব শিক্ষা মানবীয় বৃক্ষের শাখাগুলোর মাঝে শুধুমাত্র একটি শাখার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর সেই উভয় শিক্ষাই উক্ত বিধানের অনুরূপ যা নির্দিষ্ট জাতি বা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা সব রকম মানব প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখে।

এই উদাহরণ আমি পূর্বের খুতবাতেও বর্ণনা করেছিলাম, কিন্তু ভিন্ন আঙ্গিকে করেছিলাম। এখন পবিত্র কুরআনের গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

শুধু এই দৃষ্টান্তই দেন নি বরং অন্যান্য দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। যেমন তিনি (আ.) বলেন, ইঞ্জিলের শিক্ষা হলো, তুমি পরনারীর প্রতি কামলোলুপ দৃষ্টিতে দেখো না। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, তুমি কখনোই দেখো না, কামবাসনা নিয়েও নয় আর কামবাসনাহীন দৃষ্টিতেও নয়; কেননা এটি কোনো এক সময় তোমার জন্য পদস্খলনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। [এটি বলে থাকে যে, আমরা অত্যন্ত পবিত্র দৃষ্টিতে দেখছি; পবিত্র দৃষ্টিতেও দেখবে না, কেননা এটি তোমাদের জন্য পদস্খলনের কারণ হবে।] বরং

প্রয়োজনের সময় ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে নয়, বরং দৃষ্টি অর্ধনিমিলিত রেখে কাজ চালিয়ে নেয়া উচিত। [অর্থাৎ যদি প্রয়োজনও পড়ে তখন আধবোজা চোখে তাকাও যেন পুরোপুরি দৃষ্টিতে না পড়ে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিও না; (আর তা-ও) একান্তই তাকানোর প্রয়োজন পড়লে।] তিনি (আ.) বলেন, ইঞ্জিল বলে, নিজের স্ত্রীকে ব্যভিচার না করলে তালাক দেবে না, কিন্তু পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে পরিস্থিতির যৌক্তিকতা দেখে। কারণ তালাক কেবল ব্যভিচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায় আর কোনোভাবেই বনিবনা না হয় কিংবা যদি প্রাণনাশের আশংকা থাকে অথবা স্ত্রী ব্যভিচারিনী না হলেও ব্যভিচারের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ তার দ্বারা যদি প্রকাশ পায় এবং পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করে– তাহলে এমন সব ক্ষেত্রে স্বামীকে সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যদি সে সমীচীন মনে করে তাহলে (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করতে পারে। তবে তা সত্ত্বেও নিদের্শনা রয়েছে বরং কঠোর নির্দেশনা রয়েছে; [তালাক দেয়া এত সহজ নয়;] তিনি (আ.) বলেন, নিদের্শনা রয়েছে বরং কঠোর নির্দেশনা রয়েছে যেন তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে। [এখানে এ বিষয়েরও উত্তর রয়েছে যে, অনেক পুরুষের ধারণা হলো– পুরুষের তালাক দেওয়ার ঢালাও অধিকার রয়েছে, আর তারা এর অন্যায় ব্যবহার করে থাকে এবং বাড়াবাড়িও করে।] তিনি বলেন, উপযুক্ত কারণ ছাড়া তো এমনিতেই (তালাক দেয়া) বৈধ নয়, আর (উপযুক্ত কারণ থাকলেও) চেষ্টা করো যেন (তালাক) না দিতে হয়। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, এখন এটি স্পষ্ট যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মানবীয় প্রকৃতিসম্মত এবং একে পরিত্যাগ করলে কোনো এক সময় অবশ্যই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এ কারণেই ইউরোপের কিছু রাষ্ট্রকে তালাকের বৈধতা সংক্রান্ত আইন পাশ করতে হয়েছে। [এখন আইনেও এটি লেখা থাকে যে, (তালাক দেয়ার) বৈধ কারণ কী? বিভিন্ন মামলায় তারা জিজ্ঞেস করে, কারণ কী, কেনো তালাক দেওয়া হচ্ছে, কেনো বিচ্ছেদ হচ্ছে? সবকিছুর প্রমাণ দিতে হয়।] যাহোক তিনি (আ.) বলেন, এত সহজেই (তালাক) হয়ে যায় না। এ জন্য তাদেরকেও নিজের গরজে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। জাগতিক আইনকানুন তো আবশ্যিকভাবে বানানোও হয় এবং বাতিলও হয়; সেগুলোকে আরো উন্নত করার জন্য তারা চেষ্টা করতে থাকে, তারপরও কোনো না কোনো ত্রুটি থেকেই যায়। কিন্তু খোদা তা'লার আইন একান্ত মানব প্রকৃতসম্মত। একথা এখানে আবারো স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, শুধুমাত্র পুরুষদেরই তালাক দেওয়ার অধিকার দেয়া হয় নি, বরং নারীরাও নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে অথবা যে-কোনো কারণে খোলা নিতে পারে। আর যদি পুরুষ দোষী সাব্যস্ত হয় আর তাদের কোনো অন্যায় প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে পুরুষদের মোহরানা দিতে হবে না– এই ধারণা (ভুল)। তাদেরকে মোহরানাও দিতে হবে আর (অন্যান্য) অধিকারও প্রদান করতে হবে। তাই কোনো পুরুষ বা নারীর মাথায় যেন এই ধারণা না আসে যে, শুধুমাত্র পুরুষকেই (তালাকের) অধিকার দেওয়া হয়েছে। যখন মহিলাদের বরাতে আলোচনা হবে তখন এর বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে।

যাহোক, এই বিষয় অব্যাহত থাকবে। তাঁর (আ.) আরো বিভিন্ন উদ্ধৃতি রয়েছে যা এসব বরাতে বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সঠিক শিক্ষা পালন করার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)